بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ জুলাই, ২০২০ মোতাবেক ১৭ ওফা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। আহযাবের যুদ্ধ এবং হযরত সা'দ বিন মুআয এর উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন যে,

এই যুদ্ধে মুসলমানদের খুব একটা প্রাণহানি ঘটে নি। অর্থাৎ শুধু পাঁচ-ছয়জন শহীদ হন। কিন্তু অওস গোত্রের সর্বমহান নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) এত গুরুতরভাবে আহত হন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি আর এটি মুসলমানদের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল। কাফিরদের বাহিনীর মাত্র তিনজন নিহত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে কুরাইশরা এমনভাবে ধাক্কা খায় যে, এরপর তারা আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে এভাবে দল গঠন করে বের হওয়ার বা মৃদিনায় আক্রমণ করার সাহস পায় নি। আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়, যেমনটি গত খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আগামীতে কাফিররা আমাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস পাবে না। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) পরিখার যুদ্ধে হাতের কব্জিতে আঘাত পান, যার ফলশ্রুতিতে তার শাহাদত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি পরিখার যুদ্ধের দিন বের হই আর মানুষের পশ্চাতে হাঁটছিলাম, তখন পিছনে পদধ্বনি শুনতে পাই। আমি পিছন ফিরে দেখি হযরত সা'দ বিন মুআয তার ভাতুষ্পুত্র হারেস বিন অওস এর সাথে ঢাল হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি মাটিতে বসে পড়ি। হযরত সা'দ বিন মুআয এই রণসঙ্গীত পাঠ করতে করতে আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে যান যে,

লাবেছ কালিলান য়ুদরিকুল হায়জাআল হামাল
মা আহসানাল মওতা ইযা হানাল আজাল

অর্থাৎ কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর যতক্ষণ না বাহন উপস্থিত হয়। মৃত্যু কতই না উত্তম হয়ে থাকে যখন নির্ধারিত সময় এসে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত সা'দ বিন মুআয এর দেহে একটি বর্ম ছিল, তার উভয় পার্শ্ব তার (বর্মের) বাইরে ছিল। অর্থাৎ স্থুল দেহ হওয়ার কারণে বা শরীর প্রশস্ত হওয়ার কারণে বর্ম থেকে বাহিরে বেরিয়েছিল। তিনি বলেন, এ কারণে হযরত সা'দের উভয় পার্শ্ব আহত হওয়ার বিষয়ে আমার আশঙ্কা হয় কেননা, সেগুলো বর্মের বাইরে ছিল। হযরত সা'দ দীর্ঘকায় এবং ভারী গঠনগড়নের লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সা'দ বিন মুআযকে ইবনে আরেকা আঘাত করেছিল। ইবনে আরেকার নাম ছিল হাব্বান বিন ইবনে মুনাফ। সে বনূ আমের বিন লোঈ গোত্রের সদস্য ছিল। তার পিতার নাম ছিল আরেকা।

হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সা'দ বিন মুআয এর বাহুর রগে বা ধমনীতে তির বিদ্ধ হলে মহানবী (সা.) নিজ হাতে তিরের ফলা বের করে পরবর্তীতে সেই ফলা দিয়ে ক্ষতস্থানটিকে কেটে সেখানে গরম সেক দেন। অতঃপর তা ফুলে যায়। তিনি (সা.) সেটিকে পুনরায় কেটে আবার গরম সেক দেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মুশরিকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ইবনে আরেকা হযরত সা'দ বিন মুআয এর প্রতি তির নিক্ষেপ করছিল। সে একটি তির নিক্ষেপ করার সময় বলে, এই নাও, আমি হলাম ইবনে আরেকা। সেই তির হযরত সা'দ (রা.)'র বাহুর ধমনীতে বিদ্ধ হয়, আহত হয়ে হযরত সা'দ

আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! বনু কুরায়যার বিষয়ে আমাকে আশ্বস্ত না করা পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিও না। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, পরিখার যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ আহত হন। কুরাইশদের এক ব্যক্তি হাব্বান বিন আরেকা তার কব্জিতে তির নিক্ষেপ করেছিল। মহানবী (সা.) তার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু খাটিয়েছিলেন যেন কাছে থেকে তার শুশ্রূষা করতে পারেন। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ (রা.)-এর ক্ষত শুকিয়ে ভালোর দিকে যাচ্ছিল তিনি তখন দোয়া করেন, **"হে আল্লাহ্! তুমি জান যে, তোমার পথে সেই জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় আমার আর কিছু নেই যারা তোমার রসূলকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁকে দেশান্তরিত করেছে। হে আল্লাহ্! আমি মনে করি তুমি আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধের ইতি টেনে দিয়েছ। কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাদের মোকাবিলা করার জন্য তুমি আমাকে জীবিত রাখ।** অর্থাৎ যদি আরো কোন যুদ্ধ হওয়ার থাকে তাহলে আমাকে সে সময় পর্যন্ত জীবিত রাখ যাতে আমি তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি, **আর তুমি যদি তাদের এবং আমাদের মাঝে যুদ্ধের ইতি টেনে দিয়ে থাক, যেমনটি আমি ভাবছি, তাহলে আমার ধমনী খুলে দাও আর এই আঘাতকে আমার শাহাদতের কারণ বানিয়ে দাও।"** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই রাতেই ক্ষতস্থান ফেটে বা বিদীর্ণ হয়ে যায় আর তা থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। বনু গাফ্ফার গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীতে তাঁবুতে অবস্থান করছিল। রক্ত গড়িয়ে যখন তাদের কাছে পৌঁছে তখন তারা ভয় পেয়ে যায়। লোকেরা বলে, হে তাঁবুর বাসিন্দাগণ! এই রক্ত কার যা তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? অবশেষে দেখা যায়, হযরত সা'দ (রা.)-এর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল আর এর ফলেই তার মৃত্যু হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর রক্তক্ষরণ শুরু হলে মহানবী (সা.) উঠে তার কাছে যান এবং তাকে নিজের বুকে টেনে নেন। মহানবী (সা.)-এর মুখ এবং দাড়িতে রক্ত লাগছিল। কেউ তাঁকে (সা.) রক্ত থেকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করছিল, অর্থাৎ রক্তক্ষরণের কারণে মানুষ চেষ্টা করছিল যাতে তাঁর (সা.) গায়ে রক্ত না লাগে, তিনি (সা.) তত বেশি হযরত সা'দ (রা.)'র কাছে আসতে থাকেন। এমনকি হযরত সা'দ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর ক্ষতস্থান যখন ফেটে যায় আর মহানবী (সা.) তা জানতে পারেন, তখন তিনি তার কাছে আগমন করেন এবং তার মাথা নিজের কোলে তুলে নেন আর তাকে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এরপর মহানবী (সা.) দোয়া করেন, **"হে আল্লাহ্! সা'দ তোমার পথে জিহাদ করেছে এবং তোমার রসূলের সত্যায়ন করেছে আর তার ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সে তা পালন করেছে, অতএব তুমি তার আত্মাকে সেই কল্যাণে ধন্য করে গ্রহণ কর যা দ্বারা তুমি কারো আত্মাকে গ্রহণ করে থাক।"** তখনও হযরত সা'দ (রা.)-এর কিছুটা চৈতন্য ছিল, অর্থাৎ তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন, মহানবী যখন (সা.)-এর কথা বা দোয়া শুনে তিনি তার চোখ খুলেন এবং নিবেদন করেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল।** হযরত সা'দ (রা.)-এর পরিবারের লোকেরা যখন দেখলো যে, মহানবী (সা.) হযরত সা'দের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন তখন তারা ভয় পেয়ে যায়, মহানবী (সা.)-কে যখন একথা জানানো হয় যে, সা'দ এর মাথা আপনার কোলে দেখতে পেয়ে তার পরিবারের লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া হলো, **এখন তোমরা যত জন এই গৃহে উপস্থিত আছ তত সংখ্যক ফিরিশতা যেন হযরত সা'দ এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকে।** অর্থাৎ মহানবী (সা.) এই দোয়া করেন।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-কে উপহার স্বরূপ মিহি রেশমী কাপড়ের একটি জামা বা জোব্বা দেওয়া হয়। তিনি (সাধারণত) রেশমী কাপড় পরিধান করতে বারণ করতেন (তাই) সেই কাপড়টি দেখে মানুষ বিস্মিত হয়। মহানবী (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে। জান্নাতে সা'দ বিন মুআয-এর রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে– এটি বুখারীর হাদীস। অর্থাৎ তারা হাতে কাপড় দেখে ভেবেছিল মহানবী (সা.) হয়ত এটি ব্যবহার করবেন, অথচ ইতিপূর্বে তিনি এটি বারণ করতেন। কিন্তু যাহোক, তিনি (সা.) এটি দেখে বলেন, তোমরা এতে অবাক হচ্ছ। আসলে অন্যান্য হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানুষ এটি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। যেমনটি মুসলিম শরীফের হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদিসটি হলো, হযরত বারা' (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সকাশে একটি রেশমী জামা বা জোব্বা উপঢৌকন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেটিকে তাঁর সাহাবীরা স্পর্শ করে দেখতে থাকে আর এর কোমলতা দেখে আশ্চর্যের বহিঃপ্রকাশ করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি এর কোমলতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ, নিশ্চিতভাবে জান্নাতে সা'দ বিন মুআয-এর রুমাল এর চেয়েও অধিক উন্নতমানের এবং মোলায়েম হবে।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, **সা'দ বিন মুআযের মৃত্যুতে আরশও কেঁপে উঠেছে–** এটি বুখারী শরীফের হাদীস। আর মুসলিম শরীফে এটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন মুআযের জানাযা সামনে রাখা ছিল, তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এর কারণে রহমান খোদার আরশও কেঁপে উঠেছে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও কিছুটা ব্যাখ্যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন,

অওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয-এর হাতের কব্জিতে পরিখার যুদ্ধের সময় যে আঘাত লেগেছিল তা অনেক চিকিৎসার পরও ভালো হচ্ছিল না। ক্ষত ভাল হয়ে আবার ফেটে যেতো। তিনি যেহেতু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন সাহাবী ছিলেন আর মহানবী (সা.) তার সেবা-শুশ্রূষার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন, তাই তিনি (সা.) পরিখার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তার সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন যে, তাকে যেন মসজিদের উঠানে একটি তাঁবুতে রাখা হয়, যাতে করে তিনি (সা.) সহজেই তার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারেন। রাফীদা নামের এক মুসলিম নারীকে সেই তাঁবুতে নিয়োগ করা হয়, যিনি অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা বা নার্সিং-এ বেশ দক্ষতা রাখতেন। অর্থাৎ সেটি এমন তাঁবু ছিল যাতে রোগীদের রাখা হতো আর সাধারণত এই নারী মসজিদের আঙিনায় তাঁবু খাটিয়ে আহত মুসলমানদের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু এরূপ অসাধারণ যত্ন নেয়া সত্ত্বেও সা'দের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি আর সেদিনগুলোতেই বনু কুরায়যার ঘটনাও ঘটে, যার ফলে তাকে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে হয় ও কষ্ট সহ্য করতে হয় আর এর ফলে তার দুর্বলতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সেই দিনগুলোতেই এক রাতে হযরত সা'দ (রা.) খুবই কাকুতিমিনতির সাথে এই দোয়া করেন যে, হে আমার প্রভু! তুমি জান, সে জাতির বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ে জিহাদের বাসনা কত প্রবল যারা তোমার রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁকে তার স্বদেশ থেকে দেশান্তরিত করেছে। হে আমার প্রভু! আমি মনে করি এখন আমাদের এবং কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে যদি এখনও কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে আমাকে এতটুকু অবকাশ দাও যেন আমি তোমার পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের যদি অবসান ঘটে থাকে তাহলে এখন আর আমার জীবিত থাকার কোন বাসনা নেই; আমাকে এই শাহাদতের মৃত্যুর সৌভাগ্য দাও। লিখিত আছে যে, সে রাতেই সা'দের ক্ষতস্থান ফেটে এত পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয় যে, তা গড়িয়ে তাঁবুর বাইরে পর্যন্ত চলে আসে আর লোকজন

হতবিহ্বল হয়ে তাঁবুর ভেতরে যায় তখন হযরত সা'দের অবস্থা শোচনীয় ছিল আর এ অবস্থাতেই হযরত সা'দ (রা.) শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন।

হযরত সা'দ-এর মৃত্যুতে মহানবী (সা.) খুবই মর্মাহত হন। আর বাস্তবেই, তখনকার পরিস্থিতিতে হযরত সা'দের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল। আনসারদের মাঝে হযরত সা'দ-এর পদমর্যাদা ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি মুহাজিরদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ছিল। নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, ইসলামসেবা এবং রসূলপ্রেমের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যা খুব কম মানুষই অর্জন করতে পারে। তার চালচলন ও উঠাবসা থেকে প্রতীয়মান হতো যে, ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি ভালোবাসা তার আত্মার খাদ্যস্বরূপ। আর তিনি স্বীয় গোত্রপ্রধান ছিলেন বিধায় তার আদর্শ আনসারদের মাঝে অতি গভীর ও কার্যকরী প্রভাব রাখতো। এমন যোগ্য একজন আধ্যাত্মিক সন্তানের মৃত্যুতে মহানবী (সা.)-এর দুঃখ পাওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তিনি (সা.) পরম ধৈর্য ধারণ করেন এবং ঐশী সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেন আর তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

হযরত সা'দ (রা.)-এর শবদেহ যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সা'দ-এর বৃদ্ধা মাতা (সন্তানের প্রতি) ভালোবাসার আবেগে কিছুটা উচ্চ স্বরে তার জন্য বিলাপ করেন আর সেই বিলাপে তিনি তৎকালীন রীতি অনুসারে সা'দ (রা.)-এর কতিপয় গুণাবলী বর্ণনা করেন। যদিও মহানবী (সা.) নীতিগতভাবে বিলাপ করা পছন্দ করতেন না তথাপি তিনি (সা.) এই বিলাপের আওয়াজ শোনার পর বলেন, যেসব মহিলা বিলাপ করে তারা অনেক মিথ্যা বলে থাকে, কিন্তু সা'দ (রা.)-এর মাতা এখন যা কিছু বলছেন তার সবই সত্য ও সঠিক। অর্থাৎ সা'দ (রা.)-এর যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে তার সবই সঠিক। এরপর মহানবী (সা.) তার জানাযা পড়ান এবং দাফন করার জন্য স্বয়ং সাথে যান আর তাকে সমাহিত করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন এবং পরিশেষে দোয়া করার পর সেখান থেকে ফিরে আসেন।

সম্ভবত এরই ফাঁকে কোন এক সময় তিনি (সা.) বলেছেন, اهتز عرش الرحمن لموت سعد **(ইহতায্যা আরশুর্ রহমানে লিমওতে সা'দ)** অর্থাৎ, সা'দ (রা.)-এর মৃত্যুতে রহমান খোদার আরশ আনন্দে দুলতে থাকে। অন্যরা এর অর্থ করেছেন প্রকম্পিত হয়েছে বা কেঁপে উঠেছে কিন্তু তিনি (রা.) অর্থ করেছেন, আনন্দে দুলতে থাকে। অর্থাৎ পরজগতে খোদার রহমত সানন্দে হযরত সা'দ (রা.)-এর রূহ বা আত্মাকে স্বাগত জানিয়েছে। এটিই হলো আরশের আনন্দে হিল্লোলিত হওয়ার অর্থ। কিছুকাল পর যখন কোন জায়গা থেকে মহানবী (সা.)-এর জন্য উপহারস্বরূপ কিছু রেশমী চাদর বা কাপড় আসে তখন সেগুলো দেখে কয়েকজন সাহাবী সেগুলোর কোমলতা ও মোলায়েম হওয়ার বিষয়টি খুবই বিস্ময়ের সাথে উল্লেখ করেন এবং এগুলোকে এক অসাধারণ জিনিস মনে করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি এর কোমলতায় বিস্মিত হচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! জান্নাতে সা'দ (রা.)-এর চাদরগুলো এর চেয়েও অনেক বেশি কোমল এবং অধিক উন্নত মানের। বিভিন্ন হাদীসে অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রুমালের কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এখানে এর অর্থ করেছেন চাদর। যাহোক, আরবীতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে কাপড়ের জন্যও সে শব্দ ব্যবহৃত হয়।

হযরত সা'দ (রা.)-এর শ্রদ্ধেয়া মাতা তার শোকে কাঁদতে কাঁদতে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো পাঠ করেছিলেন,

ওয়াইলুন উম্মে সা'দিন সাহাদা, বারাআতান ওয়া নাজদা
বা'দা ইয়াদিন ইয়ালাহু ওয়া মাজদা
মুকাদ্দামান সাদ্দা বিহি মাসাদ্দা

অর্থাৎ সা'দের মাতা সা'দের বিয়োগে দুঃখভারাক্রান্ত, যিনি মেধা ও সাহসিকতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন, যিনি মূর্তিমান বীরত্ব ও ভদ্রতা ছিলেন। সেই অনুগ্রহকারীর মাহাত্ম্যের গান গাওয়ার ভাসা নেই! যিনি সকল শূন্যতা পূর্ণকারী নেতা ছিলেন। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, **কুল্লুল বাওয়াকি ইয়াকযিবনা ইল্লা উম্মা সা'দ**, অর্থাৎ কারো মৃত্যুতে বিলাপকারী সকল মহিলাই মিথ্যা বলে, অপ্রয়োজনীয় কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে, শুধুমাত্র সা'দের মা ছাড়া। এটি তাবাকাতুল কুবরা পুস্তকের উদ্ধৃতি। হযরত সা'দ (রা.) স্থূলকায় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তার শবদেহ উঠানো হয় তখন মুনাফিকরা বলে, হযরত সা'দ (রা.)-এর মতো হালকা শবদেহ আমরা আর কারো দেখি নি আর এমনটি হয়েছে বনু কুরায়যা সংক্রান্ত তার সিদ্ধান্তের কারণে। অর্থাৎ তারা এটিকে নেতিবাচক রূপ দিতে চাচ্ছিল। মহানবী (স.)-কে যখন এ বিষয়ে অবগত করা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! সা'দের জানাযা তোমাদের কাঁধে হালকা অনুভুত হওয়ার কারণ হলো, তার জানাযা ফিরিশ্তারা বহন করছে। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ বিন মুআযের (রা.) জানাযায় সত্তর হাজার ফিরিশ্তা উপস্থিত হয়েছিলেন যারা ইতিপূর্বে কখনোই পৃথিবীতে অবতরণ করে নি।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সা'দ বিন মুআযের (রা.) জানাযা নিয়ে যাবার সময় আমি মহানবী (সা.)-কে সম্মুখভাগে হেঁটে যেতে দেখেছি। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, যারা জান্নাতুল বাকীতে হযরত সা'দ বিন মুআযের কবর খনন করেছিলেন, আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমরা যখনই কবরের কোন অংশের মাটি খনন করি, তখনই কস্তুরির সুবাস পাই আর এভাবে আমরা লাহাদ বা কবরের নিম্নস্তরে পৌঁছে যাই। আমাদের কবর খনন সম্পন্ন হলে মহানবী (সা.) আসেন। হযরত সা'দের (রা.) জানাযা খননকৃত কবরের পাশে রাখা হয়। এরপর মহানবী (সা.) সা'দের জানাযা পড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জান্নাতুল বাকীতে এত অধিক সংখ্যায় লোক দেখতে পেলাম যেন জান্নাতুল বাকী ছিল লোকে লোকারণ্য।

আব্দুর রহমান বিন জাবের নিজ পিতার পক্ষ থেকে শুনে বর্ণনা করেন, সা'দের কবর প্রস্তুত হয়ে গেলে চারজন যথাক্রমে হারেস বিন অওস (রা.), উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.), আবু নায়েলা সিলকান বিন সালামাহ্ (রা.) এবং সালমা বিন সালামা বিন ওয়াখ্শ (রা.) হযরত সা'দ (রা.)'র কবরে নামেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দের পদযুগলের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত সা'দকে যখন কবরে নামানো হয় তখন মহানবী (সা.)-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি (সা.) তিনবার 'সুবহানাল্লাহ্' পাঠ করেন। তাঁর (সা.) সাথে সকল সাহাবীও তিনবার 'সুবহানাল্লাহ্' উচ্চারণ করেন, আর পুরো জান্নাতুল বাকী ('সুবহানাল্লাহ্র' ধ্বনিতে) প্রতিধ্বনিত হয়। এরপর মহানবী (সা.) তিনবার 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করেন। তাঁর সাথে সকল সাহাবী তিনবার 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করেন। এতে জান্নাতুল বাকী 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হতে থাকে। মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা আপনার চেহারার রং পরিবর্তিত হতে দেখেছি আর আপনি তিনবার 'সুবহানাল্লাহ্' পড়েছেন– এর কারণ কী? মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ কবরের কষ্ট অনুভব করলেন আর তাকে চাপ দেয়া হয়। যদি এটি হতে কারো পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হতো তাহলে সা'দের অবশ্যই হতো। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তার (রা.) কষ্ট দূরীভূত করেন। মিসওয়ার বিন রাফা' কুরাযী বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র মা নিজ সন্তানকে কবরে নামানোর জন্য এলে লোকেরা তাকে ফেরত পাঠাতে চায়। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। সা'দের মা আসেন এবং কবরে ইট ও মাটি দেয়ার আগ মুহূর্তে তিনি সা'দকে কবরের অভ্যন্তরে দেখতে পান আর বলেন, আমি বিশ্বাস করি– তুমি আল্লাহ্র সকাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছ। মহানবী (সা.) সা'দের কবরের সন্নিকটে তার মা'কে সমবেদনা জানান এবং এক

পাশে গিয়ে বসে পড়েন। মুসলমানরা কবরে মাটি দিয়ে সেটি সমান করে ফেলে এবং কবরের ওপর পানি ছিটিয়ে দেয়। এরপর মহানবী (সা.) কবরের পাশে আসেন, কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন এবং দোয়া করে ফিরে যান।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এবং তাঁর দু'জন সঙ্গী যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ছাড়া অন্য কারো বিয়োগবেদনা মুসলমানদের জন্য এতটা হৃদয় বিদারক ছিল না– যতটা ছিল সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর মৃত্যু। মৃত্যুকালে হযরত সা'দ বিন মুআযের (রা.) বয়স ছিল সাইত্রিশ বছর। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র মা'কে বলেন, তোমার দুঃখ কি শেষ হবে না এবং তোমার ক্রন্দন কি থামবে না অথচ তোমার পুত্র সেই প্রথম ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হেসেছেন আর যার জন্য আরশ হিল্লোলিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সা'দ (রা.)'র দাফন শেষে ফিরে আসছিলেন, তাঁর অশ্রুজল শশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। হযরত সা'দের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে; তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে আমি দুর্বল মানুষ, তবে তিনটি বিষয়ে আমি খুব সবল।' অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি খুব দুর্বল মানুষ; কিন্তু তিনটি বিষয়ে খুবই শক্তিশালী এবং আমি এগুলোতে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'প্রথমত আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যা শুনেছি, সেটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি; সেগুলোর ব্যাপারে কখনো কোন দ্বিধা হয় নি। দ্বিতীয়ত আমি নামায পড়ার সময় নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামায ছাড়া অন্য কোন চিন্তা মাথায় আসতে দেই নি।' অর্থাৎ তিনি খুব মনোযোগের সাথে নামায পড়তেন। 'তৃতীয়ত যখনই কারো জানাযা উপস্থিত হয়, তার স্থলে আমি নিজেকে মৃত জ্ঞান করে ভাবি যে, সে কী বলবে এবং তাকে কী জিজ্ঞেস করা হবে; যেন সেই প্রশ্নোত্তর আমার সাথেই ঘটছে।' অর্থাৎ তার পরকালের চিন্তা ছিল।

হযরত আয়েশা বলতেন, 'আনসারদের তিনজন এমন ব্যক্তি ছিলেন, যারা প্রত্যেকেই বনু আব্দুল আশহাল গোত্রভুক্ত ছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে আর কাউকে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হতো না; তারা ছিলেন হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এবং হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)।'

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। হযরত সা'দের ডাকনাম ছিল আবু ইসহাক। তার পিতার নাম ছিল মালেক বিন উহায়েব, অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নাম মালেক বিন ওয়াহেব-ও উল্লেখ করা হয়েছে। তার পিতা তার 'আবু ওয়াক্কাস' ডাকনামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। এ কারণে তার নাম সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তার মায়ের নাম ছিল হামনা বিনতে সুফিয়ান। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস কুরাইশদের বনু যোহরা গোত্রভুক্ত ছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সেই দশজন সাহাবীর অন্যতম, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। এই দশজন সাহাবীকে 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্' বলা হয়ে থাকে। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তাদের মধ্যে সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন। এই সাহাবীরা অর্থাৎ আশারায়ে মুবাশ্শারার সবাই মুহাজির ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস নিজের ঈমান আনার বিষয়ে বলেন, **'আমি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেদিন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি, আর আমি সাত দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করি।** আমি মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ হিসাবেই ছিলাম;' অর্থাৎ তখন মাত্র তিনজন (মুসলমান) ছিলেন। তিনি বলেন, **'আমি নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলাম।'** হযরত সা'দের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার কন্যা বলেন, হযরত সা'দ বলেছেন, **"আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি অন্ধকারের অমানিশায় রয়েছি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ আমি**

দেখি যে, চাঁদ উঠেছে আর আমি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি দেখি- আমার আগেই হযরত যায়েদ বিন হারেসা, হযরত আলী ও হযরত আবু বকর চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কখন আসলেন?' তারা উত্তরে বলেন, 'আমরাও এখনই আসলাম'।" হযরত সা'দ বলেন, **"আমি পূর্বেই সংবাদ পেয়েছিলাম যে, মহানবী (সা.) সংগোপনে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছেন। তাই আমি আজইয়াদ উপত্যকায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি।"** আজইয়াদ মক্কায় সাফা পাহাড় সংলগ্ন একটি স্থানের নাম, যেখানে এককালে মহানবী (সা.) ছাগপাল চড়িয়েছেন। **"তিনি (সা.) সবেমাত্র আসরের নামায পড়া শেষ করেছিলেন যখন আমি সেখানে পৌঁছাই, অতঃপর আমি বয়আত করে মুসলমান হয়ে যাই।"**

হযরত সা'দের কন্যা আয়েশা বিনতে সা'দ বর্ণনা করেন, "আমি আমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি, **'আমি যখন মুসলমান হই তখন আমার বয়স ছিল সতের বছর'।"** কতিপয় রেওয়ায়েতে ঈমান আনার সময় তার বয়স ঊনিশ বছর ছিল বলেও উল্লেখ রয়েছে। অতি প্রারম্ভে ইসলামগ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)'র তবলীগে এমন পাঁচজন ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন, যারা ইসলামে প্রখ্যাত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন। তাদের মধ্যে তৃতীয়জন ছিলেন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)।

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লেখা আছে আর সেখান থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তখন সা'দ টগবগে যুবক ছিলেন অর্থাৎ সে সময় তার বয়স ছিল ঊনিশ বছর। তিনি বনূ যোহরা গোত্রের অধিবাসী ছিলেন আর অত্যন্ত সাহসী এবং বীরপুরুষ ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে তার হাতেই ইরাক বিজিত হয় এবং আমীর মুআবিয়ার যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে অনেক হাদীসও বর্ণনা করেছেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর পুত্র মুসআব বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আমার মা অর্থাৎ হযরত সা'দের মা কসম খেয়েছিলেন, যতক্ষণ তিনি স্বীয় ধর্মকে অস্বীকার না করবেন তথা ইসলামকে পরিত্যাগ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে কোন কথা বলবেন না এবং কোন দানাপানিও মুখে নিবেন না। হযরত সা'দ বলেন, আমার মা আমাকে বলতেন, তুমি বলে থাক যে, তোমার ধর্ম বলে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নিজ পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তোমার মা হিসেবে আদেশ দিচ্ছি, এখনই তুমি এ ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং আমি যা বলছি তা মেনে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, মা তিন দিন পর্যন্ত এভাবেই ছিলেন এমনকি দুর্বলতার কারণে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর তার পুত্র যাকে উম্মারা বলা হতো, তিনি উঠে মাকে পানি পান করান। তার মা চেতনা ফিরে পেলে আবার সা'দকে অভিশাপ দিতে থাকেন। তখন মহাপ্রতাপান্বিত খোদা পবিত্র কুরআনে এই আয়াত وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا অবতীর্ণ করেন, অর্থাৎ, আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিয়েছি (সূরা আনকাবুত ঃ ০৯)। এটি সূরা আনকাবুতের আয়াত। অতঃপর সূরা লোকমানে রয়েছে, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي অর্থাৎ, আমার শরীক সাব্যস্ত করতে তারা উভয়ে (অর্থাৎ পিতামাতা) তোমার সাথে বিতর্ক বা পীড়াপীড়ি করলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না (সূরা লোকমান ঃ ১৬)। وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي-এর অর্থ হল, তারা আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার কথা বললে তোমরা তা মানবে না আর একইসাথে এ-ও বলা হয়েছে, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, তবে তাদের উভয়ের সাথে সঙ্গত রীতিনীতি অনুযায়ী পার্থিব বিষয়ে সদাচরণ অব্যাহত রাখবে, সম্পর্ক রাখবে সঙ্গ দেবে (সূরা লোকমান: ১৬)। তারা যদি শিরক করার বিষয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত

হয় তবে তাদের কথা মানবে না। এভাবে (পরবর্তী আয়াতগুলোতেও) এ সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশনা চলতে থাকে। পার্থিব বিষয়াদির ক্ষেত্রে রীতি অনুসারে তাদের সঙ্গ দেয়া অব্যাহত রাখ। وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ এবং তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হও।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার মাকে খুবই ভালোবাসতাম। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি ছিল মুসলিম শরীফের। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে আরেক বরাতে লেখা আছে যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর আমার মা আমাকে বলেন, তুমি এটি কোন্ ধর্ম গ্রহণ করলে? তুমি এই নতুন ধর্ম পরিত্যাগ না করলে আমি কোন দানাপানি গ্রহণ করবো না, এমনকি আমার মৃত্যু হলেও না। হযরত সা'দ বলেন, আমি তাকে বললাম, হে আমার প্রিয় মা! তুমি এমনটি করো না, কেননা আমি আমার ধর্ম কখনো পরিত্যাগ করতে পারবো না। তিনি (রা.) বলেন, পুরো এক রাত এবং এক দিন আমার মা কোন দানাপানি গ্রহণ করেন নি। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার যদি এক হাজারটি প্রাণ থাকে আর একেক করে সবগুলোই বেরিয়ে যেতে থাকে তবুও আমি কারো জন্য স্বীয় ধর্মকে পরিত্যাগ করবো না। তার মা যখন এই দৃশ্য দেখেন তখন তিনি পানাহার আরম্ভ করেন। আর সে মুহূর্তেই আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ, আর তারা উভয়ে যদি তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে যেন তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক কর مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে فَلَا تُطِعْهُمَا তুমি তাদের আনুগত্য করো না। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তাদের সাথে সদাচরণ কর।

মহানবী (সা.) সা'দকে মামা বলে ডাকতেন। একবার হযরত সা'দ সম্মুখ থেকে আসছিলেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে দেখে বলেন, ইনি আমার মামা, কারো এমন মামা থাকলে দেখাক? ইমাম তিরমিযী এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, মহানবী (সা.) এর মাতা বনূ যোহরা গোত্রভুক্ত ছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসও বনূ যোহরার সদস্য ছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হেরা পর্বতে ছিলেন আর সেটি কাঁপছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে হেরা! স্থির হও। কেননা তোমার ওপর নবী বা সিদ্দীক বা শহীদ ব্যতীত কেউ নেই। সে পর্বতে তখন মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম ও হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিআল্লাহু আনহুম ছিলেন। এটি মুসলিম এর হাদীস।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানরা গোপনে নামায পড়তো, তখন একবার হযরত সা'দ মক্কার একটি উপত্যকায় কয়েকজন সাহাবীর সাথে নামায পড়ছিলেন। তখন সেখানে মুশরিকরা এসে পড়ে। তারা মুসলমানদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা আরম্ভ করে এবং তাদের দ্বীন অর্থাৎ ইসলামের দোষত্রুটি বের করার চেষ্টা করে; এমনকি তা মারামারির পর্যায়ে উপনীত হয়। হযরত সা'দ তখন উটের হাড় দিয়ে এক মুশরিকের মাথায় এত জোরে আঘাত করেন যে, তার মাথা ফেটে যায়। এটিই ইসলামে রক্তঝরার প্রথম ঘটনা। মক্কায় কাফিররা মুসলমানদের বয়কট করে যখন আবি তালেব উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে, তখন যেসব মুসলমান

এ কষ্টের শিকার হন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। সে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, সেই দিনগুলোতে এসব নিষ্পাপ মুসলমান যেসব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন তা শুনলে গা শিউরে উঠে। সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন, কোন কোন সময় তারা পশুর ন্যায় জঙ্গলের গাছ পালার পাতা খেয়ে জীবন কাটিয়েছেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, এক রাতে তার পা এমন এক বস্তুর ওপর পড়ে যা নরম ও আদ্র মনে হয়েছে। তিনি ভাবেন হয়তো খেজুরের টুকরো হবে। তখন চরম ক্ষুধার জ্বালায় তিনি সেটি উঠান এবং গিলে ফেলেন এবং বলেন, আজ পর্যন্ত আমি জানি না সেটি কি ছিল। আরেকবার তার ক্ষুধার ভয়াবহতা এমন ছিল যে, মাটিতে তিনি শুষ্ক চামড়ার একটি টুকরো পান সেটিকে তিনি পানিতে ভিজিয়ে নরম ও পরিষ্কার করে ভুনা করে খেয়ে ফেলেন আর সেই অদৃশ্য আতিথেয়তায় পর তিন দিন অনাহারে কাটিয়ে দেন।

আল্লাহ্ তা'লা যখন মুসলমানদের হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন তখন হযরত সা'দ (রা.)ও মদিনায় হিজরত করেন এবং সেখানে গিয়ে তার মুশরিক ভাই উতবাহ্ বিন আবি ওয়াক্কাসের বাড়িতে অবস্থান করেন। উতবার হাতে মক্কার এক ব্যক্তি নিহত হওয়ায় সে মদিনায় এসে বসতি স্থাপন করে। হযরত সা'দ (রা.) প্রাথমিক মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) হিজরত করে মদিনায় আসার পূর্বেই তিনি (রা.) হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)'র সাথে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। কিন্তু অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন-সংক্রান্ত এই মতভেদের অবসানকল্পে মওলানা গোলাম আলী সাহেবের ব্যাখ্যা হলো, মক্কায় তার ভ্রাতৃত্ব ছিল হযরত মুসআব (রা.)'র সাথে এবং মদিনায় ছিল হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র সাথে। হযরত সা'দ (রা.) কুরাইশদের বীর অশ্বারোহীদের একজন ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যে কয়েকজন সাহাবী (রা.)'র ওপর ন্যস্ত ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। আবু ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর যে চারজন সাহাবী (রা.) শত্রুর ওপর অত্যন্ত জোরালো আক্রমণ করতেন তারা হলেন, হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত সা'দ (রা.)। মদিনায় হিজরতের পর কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের ভয় ও শঙ্কা থাকত। এজন্য প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা অধিকাংশ রাতেই জেগে থাকতেন আর মহানবী (সা.)ও সাধারণত নির্ঘুম রাত কাটাতেন। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মদিনার যুগে এক রাতে মহানবী (সা.) ঘুমাতে পারেন নি, তাই তিনি (সা.) বলেন, হায়! আমার সাহাবীদের মধ্যে থেকে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি যদি আজ রাতে আমাকে পাহারা দিত। তিনি (রা.) বলেন, আমরা সে অবস্থায় অস্ত্রের ঝংকার শুনতে পাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, কে? বাহির থেকে শব্দ ভেসে আসে, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। আগত ব্যক্তি উত্তরে নিবেদন করেন, আমি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। একথা শুনে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কী জন্য এসেছ? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমার হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার বিষয়ে শঙ্কা জাগে তাই আমি আপনার পাহারার জন্য এসেছি। এরপর মহানবী (সা.) সা'দ (রা.)-এর জন্য দোয়া করেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন।

বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থেই এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এতে দোয়ার বিস্তারিত বিবরণ নেই যে, মহানবী (সা.) কী দোয়া করেছিলেন? কিন্তু ইমাম তিরমিযী কিতাবুল মানাকেবে হযরত সা'দ (রা.)'র পুত্র কায়েসের বরাতে বর্ণনা করেন, আমার পিতা সা'দ (রা.)

বলতেন, মহানবী (সা.) তার জন্য এই দোয়া করেছিলেন, اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! সা'দ যখনই তোমার সমীপে দোয়া করবে তুমি তার দোয়া কবুল করো। এছাড়া **ইকমালু ফি আসমাইর রিজাল** পুস্তকে লেখা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেছিলেন, اللهم سددْ سهمه وأجب دعوته। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তার তির যেন লক্ষ্য ভেদ করে এবং তার দোয়া তুমি কবুল করো। মহানবী (সা.)-এর এই দোয়ার কল্যাণেই তিনি দোয়া কবুলিয়্যতের ক্ষেত্রে সুখ্যাতি রাখতেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর দোয়া কবুল হতো। একবার একজন তার (রা.) প্রতি মিথ্যারোপ করে আর তখন তিনি (রা.) তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! সে যদি মিথ্যাচার করে থাকে তবে সে যেন অন্ধ হয়ে যায় এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে আর তাকে ফিৎনায় নিপতিত করো। অতএব সেই ব্যক্তির জন্য (দোয়ায় উল্লিখিত) সবগুলো বিষয়ই পূর্ণ হয়। আরেকটি হাদীস রয়েছে, কায়েস বিন আবি হাযেম (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি মদিনার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম আর আমি **'হাজারুয যায়েদ'** নামক স্থানে পৌঁছে বাহনে আরোহী এক ব্যক্তিকে ঘিরে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করলাম; সে হযরত আলী (রা.)-কে গালমন্দ করছিল। ইতোমধ্যে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের মাঝে দাঁড়ান এবং লোকদের জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কী? তখন তারা বলে, এই ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে গালমন্দ করছে। হযরত সা'দ (রা.) এগিয়ে গেলে লোকেরা তাকে পথ ছেড়ে দেয় আর তিনি (রা.) গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি হযরত আলী (রা.)-কে গালি দিচ্ছ কেন? তিনি কি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন নি? তিনি কি সেই ব্যক্তি নন যিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম নামায পড়েন? তিনি কি লোকদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী (খোদাভীরু) ব্যক্তি নন? তিনি কি লোকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী নন? কথা বলতে বলতে হযরত সা'দ (রা.) আরো বলেন, মহানবী (সা.) কি তার কাছে স্বীয় কন্যা বিয়ে দিয়ে তাকে জামাতা হওয়ার সম্মান দেন নি? মহানবী (সা.)-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি কি পতাকা বহন করেন নি? বর্ণনাকারী বলেন, একথাগুলো বলার পর হযরত সা'দ (রা.) দোয়ার জন্য কিবলামুখী হন এবং হাত তুলে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তি তোমার বন্ধুদের মধ্য থেকে এক বন্ধু অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-কে যদি গালি দিয়ে থাকে তাহলে এই সমাবেশ শেষ হওয়ার পূর্বেই তুমি তোমার শক্তিমত্তা প্রদর্শন কর। এটি মুসতাদরাক হাকেমে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী কায়েস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সেখান থেকে আমাদের চলে যাওয়ার পূর্বেই সেই ব্যক্তির বাহন তাকে পিঠ থেকে নিচে ফেলে দেয় এবং পা দিয়ে তার মাথা পাথরে মারে, যার ফলে তার মাথা ফেটে যায় আর সে মৃত্যুবরণ করে।

মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পরপরই হযরত সা'দ (রা.) রাত্রিকালে যেভাবে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছেন ঠিক তদ্রুপ খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সময়কার আরেকটি ঘটনা ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) পাহারা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। অন্য সাহাবীরা যেভাবে পাহারা দিতেন মহানবী (সা.)ও তাদের সাথে একইভাবে (পালা করে) পাহারা দিতেন আর ঠান্ডায় তিনি অবসন্ন হয়ে পড়তেন। এমন অবস্থা হলে তিনি (সা.) ফিরে এসে আমার সাথে কিছুক্ষণ লেপের মধ্যে শুয়ে থাকতেন কিন্তু শরীর একটু গরম হতেই পুনরায় পরিখার সুরক্ষার জন্য চলে যেতেন। এভাবে অনবরত অনিদ্রার কারণে তিনি (সা.) একদিন ভীষণভাবে অবসন্ন হয়ে পড়েন। রাতের বেলা তিনি (সা.) বলেন, হায়! যদি কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান থাকত তাহলে আমি স্বস্তিতে কিছুটা ঘুমাতে পারতাম। এমন সময় বাহির থেকে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)'র আওয়াজ আসে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি এখানে কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আপনাকে পাহারা দিতে

এসেছি। তিনি (সা.) বলেন, আমাকে পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন নেই তুমি বরং অমুক স্থানে যাও যেখানে খন্দক বা পরিখার পাড় ভেঙে গেছে আর সেখানে গিয়ে পাহারা দাও যেন মুসলমানরা সুরক্ষিত থাকে। অতএব সা'দ (রা.) সেখানে পাহারা দেওয়ার জন্য চলে যান এরপর মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-এর বাকি স্মৃতিচারণ পরবর্তীতে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি দু'তিনটি গায়েবানা জানাযা পড়াব ও তাদের স্মৃতিচারণ করব। তাদের মধ্য থেকে প্রথমে যার স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন, জনাব মাস্টার আব্দুস সামী খান সাহেব কাঠগড়ী। তিনি গত ০৬ই জুলাই রাবওয়াতে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯৩৭ সনে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব আব্দুর রহীম সাহেব কাঠগড়ী জামা'তের প্রবীণ সেবকদের একজন ছিলেন। তার দাদা হযরত চৌধুরী আব্দুস সালাম খান সাহেব কাঠগড়ী (রা.) ১৯০৩ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন অর্থাৎ তিনি সাহাবী ছিলেন। মাস্টার সামী খান সাহেব কাদিয়ানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দেশবিভাগের পর তিনি রাবওয়ায় এসে মাধ্যমিক পাশ করেন। তার সন্তানাদির মাঝে রয়েছে এক ছেলে ও এক মেয়ে। তিন-চার বছর পূর্বে তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬০ সনে বিএসসি পাশ করার পর সে বছরই তিনি তা'লীমুল ইসলাম স্কুলে সাময়িকভাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর ১৯৬২ সালে তিনি বিএড পাশ করেন এবং নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৬৯ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএড করার পর সিনিয়র শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে তিনি রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর স্কুলের জাতীয়করণ হয়ে গেলে ১৯৭০ সালে সরকার তাকে অন্য কোন স্কুলে বদলী করে দেয় এবং তিনি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ২০০৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তিনি যয়ীম আনসারুল্লাহ্ ছিলেন এবং ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তিনি রাবওয়ার পূর্ব দারুর্ রহমত হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। স্কুলে তিনি আমারও শিক্ষক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পাঠদান করতেন। তার চেহারায় সর্বদা নম্রতার ছাপ থাকত আর তিনি খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে পড়াতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরও জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, জনাব সৈয়দ মুজীবুল্লাহ্ সাদেক সাহেবের। তিনি গত ২৮শে মে তারিখে ৮৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মুকার্‌রম সৈয়দ সাদেক আলী সাহেব এবং সৈয়দ মাহবুব আলম বিহারী সাহেবের কন্যা সৈয়দা সালমা বেগম সাহেবার সন্তান ছিলেন। কাদিয়ানের পুণ্যভূমিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কাদিয়ানের পবিত্র পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তার পিতা সাহ্‌রানপুরের সৈয়দ সাদেক আলী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার নানা হযরত সৈয়দ মাহবুব আলম বিহারী সাহেব দেশবিভাগের সময় ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে কাদিয়ানে কোন এক বিরোধীর গুলিতে শাহাদত বরণের সৌভাগ্য লাভ করেন। একইভাবে তার নানার ভাই সৈয়দ মাহমুদ আলম সাহেব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অডিটর ছিলেন। তিনি সুদূর বিহার থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান এসে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি এখানে যুক্তরাজ্যের আর্লসফিল্ড হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। অবসর গ্রহণের পর স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুক্তরাজ্যের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে দীর্ঘ ১৬ বছর কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতেন। তার চেহারায় সর্বদা নম্রতার ছাপ থাকত। তিনি রসিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি পূর্ণ মনোযোগের সাথে কাজ করতেন।

চাপ নিতেন না আর অন্যদেরকে বিরক্তও করতেন না। অন্যদের বেশিরভাগ কাজ তিনি নিজেই করার চেষ্টা করতেন। অবসরপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার বাবু মুহাম্মদ আলম সাহেবের কন্যা মুকাররমা আয়েশা সাদেক সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি রাবওয়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তার স্ত্রীও লাজনা ইমাঈল্লাহ্, রাবওয়ার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার দুই পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে। ডাক্তার কলিমুল্লাহ্ সাদেক সাহেব এমটিএ'তে সেচ্ছাসেবী হিসেবে যথেষ্ট কাজ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। তিনি ওমরাহ করতে গিয়েছিলেন, তার হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। তার স্ত্রী বলেন, তার জন্য হুইল চেয়ার সরবরাহ করা সত্ত্বেও তিনি বলেন, আমি ওমরাহ্র পুণ্য অর্জন করতে চাই, তাই পায়ে হেঁটেই যাব। একইভাবে চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি খুবই ব্যাকুল থাকতেন। তার সন্তানসন্ততি ও অন্য অনেকেই আমাকে পত্র লিখেছে এবং তার বিভিন্ন গুণাবলীর কথা লিখেছে। সন্তানরা প্রসংশা করে এটাই স্বাভাবিক আর মাশাআল্লাহ্ তার সন্তানরা যেভাবে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তার সন্তানদের হৃদয়ে খিলাফত ও জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন এবং খুব ভালোভাবে তাদের তরবীয়ত করেছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) যেমনটি বলেছেন, মানুষের প্রতিবেশী ও সহকর্মীরা প্রকৃত সাক্ষী হয়ে থাকে অর্থাৎ তারাই মানুষের পুণ্যকর্মের, আচার-ব্যবহারের প্রকৃত সত্যায়নকারী হয়ে থাকে। মুজিবুল্লাহ্ সাদেক সাহেবের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য। তার অমুসলিম প্রতিবেশীরা তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ছিলেন যাদের তিনি সেবা করেছেন এবং নিজ সন্তানদের দ্বারাও তাদের সেবা করিয়েছেন। এভাবে তার অফিসের সহকর্মীরা প্রত্যেকেই তার উত্তম আচরণ, কাজের প্রতি ভালোবাসা, গাম্ভীর্যতা এবং সেইসাথে প্রত্যেক কর্মচারীর সেবা করার কথাও উল্লেখ করেছেন। কাজ করার পাশাপাশি তিনি মানুষের সেবাও করতেন। কাউকে চা পান করাতে হলেও তিনি নিজেই পান করাতেন।

গত বছর আমি যখন ইসলামাবাদ স্থানান্তরিত হই তখন তার উদ্বেগের বিষয় ছিল, এখন আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার পিছনে জুমু'আ কীভাবে পড়ব, তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের সময়ও আমাকে একথা বলেছেন। যাহোক, এ ব্যাপারে আমি তাকে আশ্বস্ত করে বলি, ইনশাআল্লাহ্ বেশিরভাগ জুমু'আ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদেই হবে কিন্তু যখন ইসলামাবাদে হবে সেখানেও আপনি আসতে পারেন। একথা শুনে তার চেহারায় পুনরায় উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। এ কারণেই তিনি তার সন্তানদের মসজিদের নিকটে রাখার জন্য খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র হিজরতের পর মসজিদ ফযলের কাছে বাসা নেন। দৈনিক তিনি এক ঘন্টা সফর করে কর্মক্ষেত্রে যেতেন কিন্তু চাইতেন সন্তানরা যেন মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এখনও তার একই চিন্তা ছিল, দূরে চলে যাওয়ার কারণে জুমু'আ কীভাবে পড়ব? যাহোক তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। নিতান্তই বিশ্বস্ততার সাথে তিনি তার জীবন অতিবাহিত করেন আর একই বিশ্বস্ততা তিনি নিজ সন্তানদের মাঝেও সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানসন্ততিকেও সর্বদা তার আকাঙ্ক্ষানুসারে, বরং তার চেয়েও বেশি খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন। তার স্ত্রীকেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিরাপত্তার মাঝে রাখুন এবং তার জন্য প্রশান্তি ও স্বস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। (আমীন)